আত্মজীবনী

দুই যাত্রায় এক যাত্রী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্মৃতিকথা লেখার জন্য একটা চাপ থাকে - ভেতর থেকে, বাইরে থেকেও। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাপটাও বাড়ে। যে জন্য কেউ কেউ আত্মজীবনী লেখেন। আমি জানি সেই কাজটা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। আমার স্মৃতিশক্তি মোটেই প্রখর নয়, তদসত্ত্বেও এত ঘটনা ঘটেছে জীবনে, যাদের অনেকগুলো কমেডি, বেশ কয়েকটি ট্র্যাজেডি যে বাছাই করা কঠিন, ভিড়ের ভেতর থেকে কাকে ছাড়বো কাকে রাখবো ঠিক করাটা শক্ত, যে জন্য ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ আমার জন্য অসম্ভব কাজ। তবু কিছু কিছু ঘটনা বিস্মৃত হতে অসম্মতি জানায়; যাদের কয়েকটির কথা আমি বিভিন্ন সময়ে লিখেছি। সে সব ঘটনার পুনঃবিবৃতি দরকার নেই, যদিও তা আসবেই, কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত রয়েই যাবে।

বর্তমানের এই লেখার ধরনটা আত্মজৈবনিক বটে, কিন্তু এ মোটেই আত্মজীবনী নয়। কেননা এ একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত অপরদিকে তেমনি বিক্ষিপ্ত, বলা যায় এটি হচ্ছে পেছনে ফিরে দেখা, দেখতে গিয়ে কেবল নিজেকে না, দেখা আশপাশের মানুষদেরকেও। পেছনে ফিরে তাকালে নিজেকে মনে হয় একজন যাত্রী। ঘুরে দেখলে এমনটি সকলের জন্যই ঘটে, আমার জন্যই-বা ব্যতিক্রম হবে কেন। তবে আমার ওই যে যাত্রা তাতে দ্রুতগমন নেই। ছোটাছুটি করা হয়নি, চলেছি বেশ ধীরেসুস্থে, বুঝেসুজে বলা যাবে না, আমি যে খুব ধৈর্যশীল তেমনটিও টের পাইনি, কিন্তু মস্ত কোনো বাঁক ঘোরা হয়নি, এগুনোও হয়নি দ্রুতপদে। সময় চলেছে এগিয়ে, আমিও চলেছি, অনেকটা ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই। সময়টাই বরঞ্চ চঞ্চল ছিল আমার তুলনায়। আমাদের, যাদের বয়স ইতিমধ্যে সত্তরের কোঠায় পৌঁছে গেছে তাদেরকে অনেক কিছুই দেখতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে। আমরা বহু কিছু আশা করেছি, যেসব আশার অধিকাংশই পূরণ হয়নি। গন্তব্য আছে বলে ভেবেছি, যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারিনি। তবু আশা যে ছেড়েছি তা নয়। অন্তত আমি তো ছাড়তে পারিনি। ব্যক্তিগত প্রত্যাশা মিশে গেছে সমষ্টিগত স্বপ্নের সঙ্গে।

সমষ্টিগতের সঙ্গে ব্যক্তিগতের ওই সম্মিলনের ব্যাপারটাই আজ বেশি করে মনে পড়ে। নিজেকে দেখতে পাই একজন নয়, দু'জন হিসাবে।

একজন কিশোর, অন্যজন বয়স্ক। ১৯৪৭ সালে আমি কিশোর, বয়স কত? এগারো। ছাত্র ক্লাস এইটের। চলেছি আমার বাবার অভিভাবকত্বে। আর ১৯৭১-এ, ওই যাত্রার ২৪ বছর পরে? তখন আমি নিজেই একজন পিতা, আমার স্ত্রী আছেন, সন্তান আছে দুটি। যেন অন্য মানুষ একজন। অভিভাবক? মোটেই নই। একাত্তরে আমি প্রায় পলাতক। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন আমাদের ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়, গণহত্যার সূত্রপাতের সময়ই তাদের দপ্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঠিকানা সংগ্রহের নির্দেশ এসেছিল, তালিকায় আমার নাম তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন; ফলে ওই নয়মাস আমার পক্ষে কোনো ঠিকানায় বেশিদিন থাকাটা নিরাপদ মনে হয়নি, যে জন্য নানা জায়গায় থাকতে হয়েছে। অভিভাবকের দায়িত্ব পালন মোটেই সম্ভব হয়নি। বুঝেই নিয়েছি যে আমার বিপদটা দুই মাত্রার - প্রথমত বাঙালি হিসেবে, দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচয়ে।

২

সাতচল্লিশে আমরা কলকাতা ছেড়ে প্রথমে ট্রেনে পরে স্টীমারে চেপে চলেছি পদ্মাপাড়ে, ভাগ্যকুল অভিমুখে। ট্রেনের কথা ততটা মনে নেই। ট্রেনে ভ্রমণ আগেও ঘটেছে, রাজশাহী ছেড়ে যখন কলকাতায় যাই তখন, কিন্তু স্টীমার যাত্রা এই প্রথম। সে জন্য বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্মরণে রাখার কারণ আরো ছিল। সঙ্গে আমার ছোট মামা ছিলেন, তিনিও চলেছেন আমাদের সঙ্গে, কলকাতা ছেড়ে। আমার পিতার আপন ভাইবোন বলতে কেউ ছিলেন না, বাবা-মায়ের তিনি এক সন্তান। ছেলেবেলায় সব সময়ে দেখেছি, আমার ছোট মামাটির সঙ্গে আব্বার সম্পর্কটা ভাইয়ের মতো। দু'জনের আজ তাঁরা কেউই নেই, কিন্তু ওই সম্পর্কটাকে এখনো আমি জীবিত আকারেই দেখতে পাই।

আমরা যাচ্ছি মামাদের বাড়িতেই। সেখানে অনেকেই যাবেন, জানা ছিল আমাদের। স্টীমারভর্তি মানুষ, যেন উপচে পড়ছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে চলেছে দৈত্যকায় সেই নৌযান। গমগম করছে। কিন্তু স্টীমারে অল্প হলেও আলো আছে, আর সার্চ লাইট ফেলছে সে নদীর ওপর। মনে আছে স্টীমারে খাবার পাওয়া গিয়েছিল, সেই বিখ্যাত ধরনের।

যাত্রার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা ছিল বৈকি। গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত আমার পিতাকে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্তই মনে হয়েছে। ঠিকঠাকমতো স্টীমার ধরতে পারবেন কি না সে নিয়েই হবে। স্টীমারে তাকে অনেকটা নিশ্চিতই দেখেছি বলে ধারণা আমার। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তো সম্পূর্ণ অজানাই। আপাতত উঠছেন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে। তবে তাঁর অফিস কোথায় হবে সেটা জানেন না। ঢাকায় সব সরকারি দপ্তরের জায়গা হবে না এটা শুনেছেন, সে ক্ষেত্রে অন্যকোনো শহরে যেতে হতে পারে। সেখানে গেলে সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থা কী হবে, বাসা কোথায় পাবেন, সবই অজানা। তবু আশা তো ছিল যে চলেছেন নতুন সম্ভাবনার অভিমুখে।

নদীপথে স্টীমারে করে যাত্রা করেছি স্বাধীন রাষ্ট্রে পৌছাবো বলে - এখন দেখতে পাই যে এই ঘটনার একটা বস্তুগত তো অবশ্যই, প্রতীকী মূল্যও ছিল। কলকাতাতে গঙ্গা ছিল, কিন্তু সেটা ঠিক 'আমাদের' নয়, ছিল সর্বভারতীয়, আর তাকে তো ছেড়েই যেতে হচ্ছে - কেননা, কলকাতা তো এখন থেকে হবে ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত; ওদিকে পদ্মা - সে হচ্ছে নিজেদের নদী, পূর্ববঙ্গের। আমরা পদ্মাপাড়ের মানুষ, নানাবাড়ি পদ্মার কাছেই, দাদাবাড়িও যে দূরে তা নয়। আর ওই যে স্টীমারভর্তি এতো মানুষ সকলেই একই লক্ষ্যের যাত্রী - স্বাধীনতার। স্টীমারে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ডেক এই শ্রেণীবিভাজনটা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-রাতে তা আমাদের জানা ছিল না। চোখেও পড়েনি। মনে হয়েছিল সবাই সমান, সকলেই সকলের মিত্র।

দোতলায় মস্ত ডেকের এক কোণে কে একজন আসর জমিয়ে বক্তৃতা করছিলেন। তার গায়ে মস্ত এক আলখেল্লা, কালো কাপড়ের। মাথায় পাগড়ি। এখন মনে হয় তিনি ঠিক বক্তৃতা নয়, যেন ওয়াজ করছিলেন। আমার মামার অভিজ্ঞতা ছিল স্টীমারে যাতায়াতের। তিনি মনে হলো লোকটিকে আগেও দেখেছেন। সে-রাতে আলখেল্লাশোভিত মানুষটি কী বিষয়ে বাঙময় হয়ে উঠেছিলেন সেটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু কেন যেন অনুমান হয় যে নতুন রাষ্ট্রের কথাই বলছিলেন। সে-রাষ্ট্রে ধর্মচর্চা কেমন অবাধ ও আবশ্যক হবে সেই সত্যটিকেই সকলের গোচরভূত করতে চাইছিলেন।

আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম। রাতের বেলা হলেও আমার আব্বা আমাকে ওইটুকু স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কেননা জানতেন যে আমি হারিয়ে যাব না। আমার দৌড় তো বড়জোর লেকের এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত। স্মরণ করতে গিয়ে ধারণা হয়, স্টীমারে সেদিন যাঁরা যাত্রী ছিলেন তাঁদের অতি নগণ্য অংশও হয়তো সেদিন অন্তরের গভীরে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা করছিলেন না। তাঁদের ধারণা ছিল, নতুন রাষ্ট্র তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুক্তি দেবে; কিন্তু রাষ্ট্রের যারা শাসক হয়েছেন তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন দেশকে ভাগ করতে এবং ওই যে মধ্যরাতে ওয়াজে ব্যস্ত আলখেল্লাধারী তাদের মতো ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়েছেন এই লক্ষ্যে, দেশভাগের আগে যেমন পরেও তেমনি।

কিন্তু দেশ যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেটা তো সেদিন বুঝিনি। আমার বোঝার কথা নয়। অন্যরাও যে বুঝেছেন তা নয়। যদিও সাতচল্লিশে রাষ্ট্রভাঙাটা প্রধান ছিল না, প্রধান ছিল দেশভাঙা। একাত্তরে ঠিক উল্টো ঘটনা, তখন দেশভাগের ঘটনা মোটেই ঘটেনি। ঘটেছে রাষ্ট্রভাঙা। রাষ্ট্রের ভাঙন রুখতে পাঞ্জাবি শাসকেরা যে কাজটি করেছে সেটা তো আমরা কখনো ভুলবো না। একে আমরা বলি আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। প্রথমবার ছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', দ্বিতীয়বার 'জয়বাংলা'। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিও আমি দেখেছি বৈকি। কিন্তু একেবারেই ভিন্নভাবে। স্টীমারে করে নয়, পায়ে হেঁটে। এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা মনে হলো চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোটর গাড়িতে চড়ে। এ প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত ফিরে যাই সাতচল্লিশে।

সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট আবার আমরা ভাগ্যকুলে স্টীমার ঘাটে। এবার স্বাধীনতাকে অভিবাদন জানাবার জন্য। বিকেলে একটি স্টীমার আসছে গোয়ালন্দ থেকে। সেই স্টীমারের সামনে পতপত করে উড়ছে পাকিস্তানের চাঁদ-তারাওয়ালা সবুজ নিশান। সমস্তটা স্টীমারই ছোট ছোট পতাকায় শোভিত। দড়ি দিয়ে বাঁধা রঙীন কাগজ ঝুলছে সারা স্টীমারজুড়ে। স্বাধীনতা আসছে, স্বাধীনতা। স্টীমারের ঘাটে এবং নানা ধরনের নৌকায় অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আমরাও দাঁড়িয়ে। স্টীমার ঘাটের কাছে আসতেই এপার থেকে গগনবিদারী ধ্বনি উঠলো, নারায়ে তকবীর আল্লাহো আকবর, আর যেন তারই প্রতিধ্বনি স্টীমারের যাত্রীদের গলায়, মুহুর্মুহু। সেটা ছিল রোজার মাস, কিন্তু ঈদ আসার আগেই বুঝি ঈদ এসে গেছে।

সেবার আমরা গ্রামে ছিলাম বেশ কয়েক সপ্তাহ। প্রধান বিনোদন ছিল পদ্মায় নৌকা ভ্রমণ। আমার একমাত্র খালাটি মনে মনে বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁর মালিকানায় একটি কলের গান ছিল। নৌকাতে করে পদ্মায় গেলে আমরা কখনো কখনো রেকর্ডসহ গ্রামোফোনটি নিয়ে যেতাম সঙ্গে। খোলা বাতাসে হেমন্তকুমার ও জগন্ময় মিত্রের গান শোনার স্মৃতি এখনো সুখ জাগায়। তবে সব চেয়ে উপভোগ্য ছিল পদ্মায় জেলেদের ইলিশ মাছ ধরার তৎপরতা। আমরা মাছ না নিয়ে ফিরতাম না। মাছ ভাজা হচ্ছে, রান্না হচ্ছে, সকাল বেলা চিতাই পিঠার ভেতর বসানো হচ্ছে, দুপুরে কোনো কোনো দিন ইলিশ-পোলাও রান্না - মনে আছে সে সব কথা।

কিন্তু স্বাধীনতা যে স্বস্তি আনবে না সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আব্বার অফিসের জন্য সাময়িকভাবে জায়গা করা হয়েছিল ময়মনসিংহ শহরে। সেখানে বাসা পাওয়া কঠিন। অনেক খুঁজে রেল লাইনের ধারে আনন্দ মোহন কলেজের উল্টোদিকে যে একটা বাসস্থানের জোগাড় হলো সেটা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। টিনের ঘর, টিউবওয়েলের পানি, বিদ্যুৎ নেই। তবু সেখানেই ওঠা ঠিক হয়েছিল। কেননা স্কুল-পড়ুয়া সন্তানদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা চাই, নইলে এক বছর নষ্ট হবে, যেটা ঘটতে দিতে আমার পিতা কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না।

আমরা দু'ভাই ভর্তি হয়েছিলাম শহরের জিলা স্কুলে। ভর্তি হতে গিয়ে দেখি অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার হিসেবে কলকাতা থেকে এসেছেন কবি কাদের নওয়াজ। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কবিতা আমার পড়া ছিল। মাসিক 'মোহাম্মদীতে'ও পড়েছি বলে মনে পড়েছে। প্রথম সামনাসামনি ওই আমার একজন কবি সন্দর্শন। আর পেয়েছিলাম একজন সহপাঠীকে, লুতফর রহমান খান, ডাকনাম ভোলা, যার সঙ্গে আমার প্রথম দিনেই গভীর বন্ধুত্বের পত্তন হয়েছিল, যে বন্ধুত্ব বহুকাল স্থায়ী হয়েছে, দেখা-সাক্ষাৎ যে সব সময়ে হয়েছে তা নয়, তবে চার বছর পরে আমরা দুজনেই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েছি এবং পাস করে যোগ দিয়েছি শিক্ষকতায়, ভোলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, আমি ইংরেজিতে তখন বন্ধুত্ব নতুন মাত্রা পেয়েছিল, কিন্তু আবার বিচ্ছেদ ঘটলো সে যখন চলে গেল সিভিল সার্ভিসে, আর আমি রয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়েই। আমাদের দুজনের আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। ভোলা পছন্দ করতো ক্রিকেট খেলতে, আমার উৎসাহ ছিল সাহিত্যপাঠে; কিন্তু ময়মনসিংহে যে কয় মাস ছিলাম প্রায় প্রতিদিন দু'বন্ধুতে বেড়াতে বের হতাম, বিকেলবেলায়। যেতাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। নদী আমাকে টানতো; টানতো তাকেও। সে আজ নেই, ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে